নাম: মো: সাইফুল ইসলাম

জন্ম তারিখ: ৬ আগস্ট, ১৯৯৭

শহীদ হওয়ার তারিখ: ২০ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : গাড়ি চালক; ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট কারচালক
শাহাদাতের স্থান : জাহাবক্স লেন, মগবাজার, ঢাকা

শহীদের জীবনী

জন্ম হয়েছিল তাঁর ১৯৯৭ সালের ৬ আগস্ট, যে মাসেই অনেক বছর পর, ২০২৪ সালে, তিনি শহীদ হবেন নিজের জন্মদিনের আগে, রাষ্ট্রীয় গুলির আগুনে।এ যেন পূর্বনির্ধারিত কোনো নিয়তির কাব্যিক নির্মমতা।বাড়ি ছিল বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বড় কোঠা গ্রামে, নদীর ধারে, গরিব মানুষের ঘামে ঘেরা এক সবুজ জনপদ।পিতা চাঁন মিয়া ছিলেন কৃষক, মৃত্তিকার সন্তান, আজ মৃত।মা সালেহা বেগম, এখনও ঢাকার এক বস্তিতে কাজ করেন, মানুষে মানুষে বাসা পাল্টে জীবন টানেন গামছায় জড়িয়ে।বয়স ৬২ পেরিয়েছে, চোখে ছানি জমেছে, কিন্তু কাঁধে এখনো সংসারের বোঝা, পিঠে এখনো জীবনের জরুরি আহ্বান। তাঁর একমাত্র ভাই আল আমিন একটি গ্যারেজে ম্যানেজার, কাজ করেন সকাল-সন্ধ্যার অন্ধকারে।চার বোন রুনা, সুমা, নিপা, শারমিন সবাই কোনো না কোনোভাবে শ্রমবাজারের চোখ এড়িয়ে বেঁচে আছেন গার্মেন্টসে কিংবা গৃহিণীর ভূমিকায়।এ এক সংসার, যেখানে প্রতিটি সদস্য জন্ম থেকেই দায়গ্রস্ত; যেখানে স্বপ্ন মানেই দায়, জীবন মানেই ক্ষয়।

এই সংসারের মধ্যম সন্তান ছিলেন সাইফুল ইসলাম।বাহ্যিকভাবে তিনি ছিলেন একজন গাড়িচালক।তাঁর কর্মজীবনের দৃশ্যপট ছিল ঢাকা শহরের যানজটে ঘেরা রাস্তাগুলি পেছনে স্টিয়ারিং, সামনে রিকশা, প্রাইভেট কার আর বাসের বিকট শব্দ।কিন্তু তার ভিতরে বাস করত এক বিশাল মানুষ একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, যার বিশ্বাস ছিল একদিন নিজের গ্যারেজ খুলবেন, যেখানে শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে দেখা হবে, মজুরিকে মূল্য বলা হবে।
তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায় ১৯ জুলাই ২০২৪।রামপুরার কাঁচাবাজারের পাশে, যখন আন্দোলন চলছিল চারদিকে, সাইফুল ছিলেন মিছিলে, ব্যানার হাতে।রাষ্ট্রের চোখে তাঁর অপরাধ ছিল অন্যরকম তিনি ছিলেন গরিব, তিনি ছিলেন যুবক, আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অদৃশ্য শ্রেণির প্রতিনিধি।তাই রাষ্ট্র তাঁকে গুলি করেছিল তলপেটে সেই পেটে, যেটি চালাত একটি পরিবারকে, যেটি গিয়েছিল ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুবার।তাকে নেওয়া হয়েছিল বেটার লাইফ হাসপাতালে।গুলি তখনও পেটে, কিন্তু ডাক্তাররা সেটি বের না করে সেলাই করে দেন তাঁকে, যেন মৃত্যুটা একটু পরিণত হয়, একটু সময় নিয়ে আসে। রাষ্ট্রের এই চিকিৎসাহীন ঘৃণা, এই ঠান্ডা নির্যাতন, এক নবীন বিপ্লবীর মৃত্যুকে শুধু নিশ্চিতই করেনি, সেটিকে করে তুলেছে ধ্বংসাত্মক এক উদাহরণ।
বাসায় ফিরে তিনি ভুগেছেন ১২ ঘণ্টা।প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, চিৎকার করে বলেছেন "আমার পেট পুড়তেছে।' মা'র কোল ভিজেছে তাঁর রক্তে, তার মৃত্যুর হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশীদের ঘরে, গ্রামের বাতাসে, আর শহরের নিঃশব্দ প্রাচীরে।সাইফুল ইসলাম ছিলেন না শুধুই শহীদ।তিনি ছিলেন একটি শ্রেণির কণ্ঠ, এক নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।তাঁর মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই রাষ্ট্রের মৃত্যুপরোয়ানা শুধু গুলিতে লেখা হয় না, সেটা লেখা হয় হাসপাতালের নিষ্ক্রিয়তায়, মানুষের নির্লিপ্ততায়, আর আমাদের ভয়ভীত মুখে।
আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
২০২৪ সালের জুলাই মাস বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন জুলাইক্যালেন্ডার, যেখানে প্রতিটি দিন ছিল লাল অক্ষরে লেখা, আর রাত ছিল আগুন ও গুলির নিকষ কালো।কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের আগুন ধরিয়েছিল, তা আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ছুঁয়ে থাকেনি।তা ছড়িয়ে পড়ে নীচুতলার মানুষের ঘামঝরা ঘরে, ছিন্নমূলের কান্নায়, রিকশার টায়ারে আর গার্মেন্টসের সেলাই মেশিনে।শহরগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী জ্বলছিল ভেতর থেকে।এই ছিল এক গণজাগরণ, যেখানে "বৈষম্যের অবসান চাই!" ছিল কেবল একটি স্লোগান নয়, ছিল একটি বেঁচে থাকার প্রার্থনা, একটি মরার আগের শেষ আর্তি।এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল না কেবল শিক্ষিত ছাত্ররা, ছিল একজন রিকশাওয়ালার ঘামে, একজন গাড়িচালকের ক্লান্ত চোখে, একজন চা-বিক্রেতার পুঁজিহীন পুঁজিতে।সাইফুল ইসলাম ছিলেন তাঁদেরই প্রতিনিধি নামহীন, পদবিহীন, তবু সাহসী।তিনি ছিলেন না কোনও মিছিলের নেতা, তাঁর হাতে ছিল না মাইক্রোফোন, তাঁর ছবি ছিল না ফেসবুকের হেডলাইনেই, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল রাষ্ট্রের অসাম্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ।আর এই নীরবতা থেকেই রাষ্ট্র ভয় পায় সবচেয়ে বেশি।
১৯ জুলাই, দুপুর আড়াইটায় ঠিক তখন যখন ঢাকার রাস্তায় ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হচ্ছিল পুলিশের জলকামানে, যখন ব্যারিকেডের ভেতর গর্জে উঠছিল জনতার কণ্ঠ, ঠিক তখনই সাইফুল ছিলেন রামপুরা কাঁচাবাজারে, ছিলেন মিছিলের অংশ, কিন্তু রাষ্ট্র কখনো নাম দেখে গুলি চালায় না, রাষ্ট্র দেখে শ্রেণি।গুলিটি তলপেটে ঢুকেছিল সেই পেটে, যা যুগের পর যুগ ধরে গরিবের পরিবারকে আগলে রেখেছে, অভুক্ত থেকে সন্তানকে খাইয়েছে, ভাঙা পাতে ভাত সাজিয়েছে।তাঁকে নেওয়া হয় বেটার লাইফ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ।গুলি বের না করেই, তাঁকে 'সেলাই' করে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বাসায়।এ যেন ডাক্তারি সনদে লেখা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুলি, আরও ঠান্ডা, আরও নিষ্ঠুর।এর নাম চিকিৎসা ছিল না, এর নাম ছিল শ্রেণিবৈষম্যের চিকিৎসাবর্জিত হত্যা।১২ ঘণ্টা ধরে সাইফুল মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছেন, কাঁপতে কাঁপতে বলে গেছেন, "মা, আমার পেটটা জ্বলতেছে" এমন এক আর্তনাদ, যা রাষ্ট্রের কানে যায় না, সংবাদে আসে না, ইতিহাসে লেখা হয় না।

ভোর ৭টায়, ২০ জুলাই, গাবতলার বাসায়।তিনি মারা যান, মৃত্যুর আগেই রাষ্ট্র তাঁকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছিল।পাশে ছিল মা, ভাই, এবং একটি নীরব সমাজ।যা প্রতিবাদ করতে জানে না, জানে শুধু দেখেও চুপ থাকতে।কিন্তু জানে, এই মৃত্যু শুরু হয়েছিল কাঁচাবাজারের রাস্তায় গুলির আঘাতে, আর শেষ হয়েছিল

হাসপাতালে রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততায়।এই মৃত্যু কেবল সাইফুল ইসলামের নয়, এ ছিল একটি শ্রেণির মৃত্যু, একটি যুগের প্রতীকী সমাপ্তি।এভাবেই জুলাই বিপ্লব রক্ত দিয়ে লিখে গেছে শহীদদের নাম নয় বরং রাষ্ট্রের মুখোশও।

পরিবারের হাহাকার ও মৃত্যুর পরে নীরব অপমান

শহীদ সাইফুল ইসলাম একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের চালক, যিনি রাষ্ট্রের সকল অবহেলা ও বৈষম্যের প্রতীক হয়ে আজ কবরস্থ।কিন্তু তাঁর মৃত্যু আসেনি হঠাৎ ঝড়ে, এটি ছিল পরিকল্পিত, স্তব্ধ, আর্তনাদ-বিহীন এক নির্মমতা।তাঁর ভাই আল আমিনের জবানিতে ওঠে আসে সে নির্মম সত্য: "ডাক্তাররা গুলি না বের করেই পেট সেলাই করে দিয়ে আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দেন।' এটা কি কেবল চিকিৎসা-ব্যবস্থার ব্যর্থতা? না এটা এক নতুন ধরনের মৃত্যু নির্বাক হত্যার শৈল্পিকতা।রাষ্ট্র যেভাবে গুলি ছোঁড়ে, ঠিক সেভাবেই হাসপাতাল গুলি রেখে দেয় পেটের ভিতরে, যেন জীবন্ত রেখে কষ্টে মরতে দেয় মানুষটিকে।আর সেই কষ্টের রাতটা? একটি শবযাত্রার আগে দীর্ঘ যন্ত্রণার উপাখ্যান।শহীদ সাইফুল তাঁর বাসায় ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি ঘুমাতে পারেন না।চোখ খোলা রেখে ছটফট করেন, থেমে থেমে জিজ্ঞেস করেন, "জল দাও" কিন্তু তাঁর চোখের ভাষা বলে, এ জল নয়, এ দেশ তাকে কিছু দিতে পারবে না।তাঁর মুখে তৃষ্ণা, রক্তে বিষ, আর ঘরে এক সাগর নীরব কান্না।মা সালেহা বেগম চোখে ছানি, হাতে রান্নার পুরনো পোড়া দাগ সেই রাতে কেবল তাকিয়ে ছিলেন ছেলের কষ্টে মোচড় খাওয়া পেটে।আল আমিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার কোণে ভাইয়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কতটা ব্যথা সহ্য করলে এক গরিব মানুষও বলতে পারে না, "বাঁচাও"।

২০ জুলাই, সকাল ৭টা।রাজধানী ঢাকা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে রাস্তায় নাস্তার দোকান খুলছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, মেট্রো রেলের কাঁচে ঘাম জমছে।আর তখনই গাবতলার একটি ঘরে থেমে যায় সাইফুলের নিঃশ্বাস।তিনি মারা যান কিন্তু এ মৃত্যু ছিল না 'হৃদরোগে' বা 'রক্তক্ষরণে'।এই মৃত্যু ছিল রাষ্ট্রীয় অবহেলার, শ্রেণিবিভাগের, এবং ক্ষমতালিপ্সু প্রশাসনের হাতে এক পরিকল্পিত নির্মূল।হাসপাতালে গুলি রেখে দেওয়া হয়েছিল যেন মৃত্যুটাও গরিবের ঘরে হয় তাতে যেন জাতির তকমা না লাগে, কোনো দায় না পড়ে কারও ঘাড়ে।লাশ নেওয়া হয় বরিশালের বড় কোঠা গ্রামে।পথে কেউ জিজ্ঞেস করে না, "কে মারা গেছে?" কেউ চিৎকার করে না, "আর কত?" সবাই চুপ।যেন মৃত্যুই নিয়ম, যেন সাইফুলদের জন্য শহর শুধু কর্মস্থল, না ফেরার গলি।তাঁকে কবর দেওয়া হয় মাটির নিচে একটি টুকরো সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে, চোখে কাপড়ের উপর একবিন্দু তেলও না।কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদেন মা, আর চার বোন, আর ভাই আল আমিন তাঁরা কাঁদেন না শুধু ছেলের জন্য, কাঁদেন নিজের শ্রেণির চিরস্থায়ী অসহায়ত্বের জন্য।

এই মৃত্যু সংবাদ কোথাও ছাপা হয়নি।কোনো টিভি চ্যানেল বলেনি, "আজ এক গরিব চালক শহীদ হয়েছেন।' কোনো মন্ত্রী ফোন করেনি, কোনো নেতা টুইট করেনি, কোনো পতাকা অর্ধনমিত হয়নি।অথচ এই পরিবার জানে তাদের সাইফুল কেবল একটি চালক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ২০২৪ সালের মুক্তিযুদ্ধের একজন অঘোষিত সৈনিক।তাঁকে কোনো সংগঠন চায়নি, কোনো পোস্টার তাঁকে সম্মান দেয়নি তবু তাঁর পেটের গুলির দাগটি আজও জনতার হৃদয়ে কাটা হয়ে আছে।এই মৃত্যু একা নয়।এটি একটি প্রজন্মের বেদনা, একটি শ্রেণির নীরব হাহাকার এবং একটি প্রশ্নের উত্তর: "আমরা কি গুলি খাওয়ার জন্যই জন্মাই?" সাইফুল ইসলাম শুধু চালক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি হাইব্রিড রাষ্ট্রের মুখে তুলে ধরা সাধারণ মানুষের সাহস।তিনি গাড়ি চালাতেন, আজ তাঁর মৃত্যুই চালাচ্ছে আমাদের বিবেক।এমন শহীদকে স্মরণে না রাখলে, আমরা কেউই জীবিত নই, শুধু চলমান লাশ।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণনাম : মো: সাইফুল ইসলাম
পেশা ও কর্মপরিচয় : গাড়ি চালক; ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট কারচালক
জন্ম তারিখ ও স্থান : ০৬ আগস্ট, ১৯৯৭; জন্মস্থান: বরিশাল
বয়স (শাহাদাতের সময়) : ২৬ বছর
পিতার নাম : মৃত মোঃ চাঁন মিয়া
মাতার নাম, বয়স ও পেশা : ছালেহা বেগম, বয়স: ৬২ বছর; পেশা: গৃহকর্মী
ভাইবোন : মোট ৫ জন (ভাই ১ জন, বোন ৪ জন)
ভাই: মো: আল আমিন (বয়স ২৮), পেশা: সিএনজি গ্যারেজ ম্যানেজার
বোন: রুনা বেগম (বয়স ৩৮), পেশা: গৃহিণী (বিবাহিত)
বোন: সুমা বেগম (বয়স ৩৭), পেশা: গৃহিণী (বিবাহিত)
বোন: নিপা বেগম (বয়স ৩১), পেশা: গার্মেন্টস কর্মী
বোন: শারমিন আকতার (বয়স ৩৩), পেশা: গৃহিণী (বিবাহিত)
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বড় কোঠা, ডাকঘর: ধামুরা, ওয়ার্ড নং-০২, ইউনিয়ন: উত্তর বড় কোঠা
থানা/উপজেলা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা (ঢাকায়) : বাসা নং-৬৬৭/৩, জাহাবক্স লেন, মগবাজার/গাবতলা (সাবেক রমনা), থানা-হাতিরঝিল
(কাউন্সিলর সনদ ও জন্ম সনদ অনুযায়ী রমনা/মগবাজার), ঢাকা-১২১৭।(ওয়ার্ড নং-৩৫)
আহত হওয়ার স্থান : রামপুরা কাঁচা বাজার এলাকা, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ ও সময় : ১৯ জুলাই, ২০২৪ (শুক্রবার), দুপুর ২:৩০ মিনিট।
আহত হওয়ার বিবরণ ও চিকিৎসা : জুমার নামাজের পর রামপুরা কাঁচা বাজার এলাকায় তলপেটে গুলিবিদ্ধ হন।বন্ধুদের সহায়তায়
তাকে বেটার লাইফ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে (ভাইয়ের
ভাষ্যমতে, পেটের ভেতর গুলি রেখেই সেলাই করে) বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
মৃত্যুর কারণ (বর্ণনা অনুযায়ী) : পেটে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর তিনি তীব্র যন্ত্রণায় ভুগতে থাকেন এবং পরদিন
সকালে মৃত্যুবরণ করেন
আঘাতকারী : পুলিশ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ২০ জুলাই, ২০২৪, শনিবার, সকাল ৭:০০ টায়; ৬৬৭/৩, জাহাবক্স লেন, মগবাজার, ঢাকা)
দাফন/কবরের অবস্থান : নিজ গ্রাম (বড় কোঠা, উজিরপুর, বরিশাল)

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ ও মাসিক ভাতা

২. মা সালেহা বেগমের জীবনসীমার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা

৩. শহীদের বড় ভাই আল আমিনের চাকরির ব্যবস্থা বা সরকারি সহায়তা প্রদান কড়া যেতে পারে